বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিবেদন, ২০০৮
ব্যুরো অব ডেমোক্রেসি, হিউম্যান রাইটস এন্ড লেবার কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র-ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তবে শাসনতন্ত্রে এই মর্মে বিধান রাখা হয়েছে যে, যে কোন ব্যক্তি আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে তার নিজ পছন্দ অনুসারে যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, পালন ও প্রচার করতে পারবেন। এখানে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অথবা এদের কোন অংশের নিজ নিজ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা করার অধিকার রয়েছে। সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতাকে সমর্থন করলেও যে সময়কালের ঘটনাবলীর আলোকে এই প্রতিবেদন তৈরী করা হয়েছে সে সময়ে ধর্ম এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আঘাত একটা সমস্যা হিসেবে বিরাজমান ছিল। পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সময়কালসমুহে ঘটলেও, বর্তমান প্রতিবেদনের সময়কালে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়নি বা তাদের কোন প্রতিষ্ঠানের ওপর অবরোধ আরোপের চেষ্টা করা হয়নি, তবে তাদের ওপর হয়রানির ঘটনা ঘঠেছে। আহমদিয়াদের অ-মুসলিম ঘোষণা করার দাবি মাঝে মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে উঠেছে, তবে সরকার বরাবর আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোক ও তাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষায় কার্যকরভাবে পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজনীতির ওপর ধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ইসলামি চেতনার প্রতি সংবেদনশীল ছিল।

প্রতিবেদনে বিবেচ্য সময়কালে ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রতি সরকারের শ্রদ্ধাবোধের মাত্রায় কোন পরিবর্তন হয়নি। দেশের নাগরিকরা সাধারণত: স্বাধীনভাবে আপন ধর্ম পালন করেছেন, তবে পুলিশসহ সরকারি কর্মকর্তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রায়শই অকার্যকর ছিল এবং কোন কোন সময় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়ন ও হামলার ক্ষেত্রে ধীরগতিতে তাদেরকে সাহায্য করেছে। সরকার এবং সুশীল সমাজের অনেক নেতা বলেছেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর উৎপীড়নের পেছনে সাধারণত রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক মতলব ছিল, শুধুমাত্র ধর্মীয় বিশ্বাস বা ধর্মীয় আনুগত্যের কারণে এসব ঘটেছে - তা বলা যাবে না।

এই প্রতিবেদনে ধরা সময়কালে ধর্মীয় বিশ্বাস ও চর্চার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের খবর পাওয়া গেছে। হিন্দু, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধরা বৈষম্যের শিকার হয়েছেন এবং কোন কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। আহমদিয়াদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণার দাবির সাথে সাথে তাদের ওপর উৎপীড়নও অব্যাহত ছিল।

মানবাধিকার উন্নয়নের সামগ্রিক নীতির অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারের সাথে ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনা করে থাকে। সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক এবং প্রকাশ্য বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য সরকারকে উৎসাহিত করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করেছে এবং সকল নাগরিকের জন্য যথাযথ পদ্ধতি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানিয়েছে। রাষ্ট্রদূত এবং চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের

সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন স্বনামধন্য মুসলিম ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে বাংলাদেশ সফরের ব্যবস্থা করেন। এই সফর ছিল ফলপ্রসূ। তিনি সহিষ্ণুতা ও নারী-পুরুষ ন্যায্যতার সমর্থনকারী কুরআনের ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরেন।

অনুচ্ছেদ ১: ধর্মীয় জনসংখ্যা তত্ত্ব

বাংলাদেশের আয়তন ৫৫,১২৬ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ১৫ কোটি ৪০ লাখ। ২০০১ সালের আদম সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী দেশের ৮৯.৭ শতাংশ মানুষ সুন্নি মুসলমান। ৯.২ শতাংশ হিন্দু, বাকিরা প্রধানত: খ্রিস্টান (অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক) এবং থেরভেদ-হিনযান বৌদ্ধ। পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে উপজাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা কেন্দ্রীভূত বেশী, তবে অনেক যায়গায় উপজাতীয় ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যদের সাথে একই এলাকায় বসবাস করছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় আদিবাসী (অবাঙ্গালি) জনগণের মধ্যেই অধিকাংশ বৌদ্ধ দেখা যায়। বাঙ্গালি ও জাতিগত সংখ্যালঘু আদিবাসী খ্রিস্টানরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশের নানা স্থানে বসবাস করছেন, যেমন- বরিশাল শহর, বরিশালের গৌরনদী, গোপালগঞ্জের বানিয়ারচর, ঢাকার মনিপুরী পাড়া, ঢাকার মহাখালীর খ্রিস্টান পাড়া, গাজীপুরের নাগরী এবং খুলনা শহর। এছাড়াও অল্প সংখ্যক শিয়া মুসলমান, শিখ, বাহাই, অ্যানিমিস্ট বা প্রকৃতি পুজারী ও আহমদিয়া জনসাধারণ রয়েছেন। এই ধরনের প্রতিটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর লোকসংখ্যা আনুমানিক কয়েক হাজার থেকে এক লাখ পর্যন্ত। এখানে এদেশীয় কোন ইহুদি সম্প্রদায়, এমনকি উল্লেখ করার মত অভিবাসী ইহুদিও নেই। নাগরিকদের সম্প্রদায়গত পরিচিতির ক্ষেত্রে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল- এমনকি যারা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন প্রার্থনায় বা অন্যান্য ধর্মীয় কর্ম-কান্ডে অংশগ্রহণ করেন না- তাদের বেলায়ও।

এদেশে বসবাসরত বিদেশী নাগরিক হিসেবে শ্রেণীকৃত অধিকাংশ ব্যক্তিই হলেন বিদেশ থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশী, এরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী । এদেশে ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রায় ৩০,০০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী রয়েছেন যারা দেশের দক্ষিণ-পূর্বে কক্স বাজার এলাকায় থাকেন। খ্রিস্টান মিশনারীদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। এদেশে কিছু ধর্ম-ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) কাজ করে।

অনুচ্ছেদ ২: ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিস্থিতি
আইন/ নীতিগত কাঠামো

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তবে সংবিধানে এই মর্মে বিধান রাখা হয়েছে যে, আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে কোন ব্যক্তি তার নিজ পছন্দ অনুসারে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন,পালন ও প্রচার করতে পারবেন।

২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াজুদ্দিন আহমেদ দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের সাবেক গভর্ণর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদকে প্রধান করে একটি তত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ করেন। জুলাই মাসে আহমেদ ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনের পর ২০০৮ সালের শেষ নাগাদ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সরকার প্রকাশ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা সমর্থন করলেও আলোচ্য সময়কালে ধর্মীয় এবং জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণের ঘটনা একটা সমস্যা হিসেবে বিরাজমান ছিল।

ব্যক্তির পছন্দমত ধর্ম প্রচারের অধিকার সংবিধানে প্রদান করা হলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও সম্প্রদায়গুলো ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাউকে অন্য ধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টার প্রায়শ:ই বিরোধিতা করেছেন।

সাধারণত: সরকারি প্রতিষ্ঠান ও আদালত আলোচ্য সময়কালে ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করেছে। সরকার ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী পরিচালনা করেছেন এবং ইসলাম ধর্মীয় উৎসবের দিন-তারিখ ঘোষণা করেছেন, কিন্তু খুতবার বিষয়বস্তু কি হবে তা নির্ধারণ করেন নি, ইমাম নির্বাচন করেন নি বা তাদের বেতনভাতাও প্রদান করেন নি, এবং ধর্মীয় বিদ্যালয় বা মাদরাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়গুলো যাচাইও করেন নি।

২০০১ সাল থেকে সরকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবগুলোয় নিয়মিত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকদের মোতায়েন করেছেন, কেননা জঙ্গীরা এসব উৎসব-অনুষ্ঠানকে তাদের সহজ লক্ষ্যবস্তু করতে পারে।

শরি'য়া (ইসলামি আইন) আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি এবং তা অ-মুসলিমদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়নি; তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের দেওয়ানী বিষয়ে এ আইন শক্তিশালী ভূমিকা পালন করেছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভূমির মালিকানার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় এমন দেওয়ানী বিষয়ে এবং পারিবারিক কলহ দূরীকরণে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে এ ধরণের বিবাদ নিরসনে মধ্যস্থতাকারিরা শরিয়া'র মূলনীতির ওপর নির্ভর করেছেন। এছাড়াও মুসলিম পারিবারিক আইন শিথিলভাবে শরিয়া'র ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

২০০১ সালে হাই কোর্ট শরি'য়ার ওপর নির্ভর করে আইনি মতামত প্রদান বা ফতোয়াকে বেআইনি ঘোষণা করে। তবে, একদল ধর্মীয় নেতা এর বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করার কারণে এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ করা যায়নি। যে সময়কালের আলোকে এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে সে সময়কালের শেষ পর্যন্ত বিষয়টি অমীমাংসিতই ছিল।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ২০০৮ সালের ৮ই মার্চ তারিখে একটি নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার বিরুদ্ধে কয়েকটি ইসলামপন্থী দল সহিংস প্রতিবাদ জানায়। তাদের বক্তব্য হলো, এই নীতিতে নারী ও পুরুষকে সম উত্তরাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা শরি'য়া নীতিমালা ও সেই সঙ্গে মুসলিম পারিবারিক আইনের সাথে সাংঘর্ষিক। যদিও উপদেষ্টাগণ (মন্ত্রী) প্রকাশ্যে এসব সমালোচনা খন্ডন করেছেন, তথাপি ঘোষিত এই নীতি পর্যালোচনার জন্য সরকার আলেমদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দেন। জাতীয় মসজিদের প্রধান ধর্মীয় নেতাকে প্রধান করে গঠিত এই কমিটি এই নীতিতে পরিবর্তন আনার বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেন। সরকার অবশ্য এসব সুপারিশের ওপর কোন ব্যবস্থা নেন নি, এবং আমাদের আলোচ্য সময়ের শেষ পর্যন্ত সরকারের এই নীতির বাস্তবায়ন হয় নি। নারী অধিকার কর্মীরা কোন রকম পরিবর্তন ছাড়াই এই নীতি বাস্তবায়নের আহ্বান জানান এবং পর্যালোচনা কমিটি গঠন করায় সরকারের সমলোচনা করেন।

ইসলামি ঐতিহ্য অনুযায়ী যেখানে শুধুমাত্র মুফতী বা ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতই কেবল ফতোয়া দেবার অধিকারি, সেখানে গ্রাম্য মৌলবিরাও কখনও কখনও কোন ব্যক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সেই ঘোষণাকে ফতোয়া বলে চালিয়ে দেন। কোন কোন সময় এই ঘোষণার ফলে প্রায়শই নারীদের বিরুদ্ধে অনুমিত নৈতিক স্খলনের অপরাধে বিচার বহির্ভূত শাস্তি প্রদান করা হয়।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী বিবাহ, তালাক ও দত্তক গ্রহণ সংক্রান্ত পারিবারিক আইনের কিছুটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব পারিবারিক আইন রয়েছে। একজন মুসলমান পুরুষরা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করতে পারেন; তবে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত স্ত্রী গ্রহণের জন্য তাকে প্রথম স্ত্রীর লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হয়। সমাজ বহুবিবাহ ব্যবস্থা দারুণভাবে নিরুৎসাহিত করে এবং বহু বিবাহের প্রচলন নেই বললেই চলে। অপরদিকে, খ্রিস্টান পুরুষরা মাত্র একজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারেন। হিন্দু আইনে সীমাসংখ্যাহীন বহুবিবাহের অনুমতি দেয়া হয়েছে; তবে তালাক বা আইনগত বিচ্ছেদের কোন বিধান নেই। হিন্দু বিধবারা আইনগতভাবে পুনঃবিবাহ করতে পারেন। বিভিন্ন ধমীর্য় গোষ্ঠীগুলোর নারী-পুরুষের মধ্যে আন্ত:ধর্ম বিবাহের ক্ষেত্রে কোন আইনগত প্রতিবন্ধকতা নেই। বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান ও পদ্ধতি সংশিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পারিবারিক বিধান অনুযায়ী সম্পন্ন হয়ে থাকে। তবে বিয়ে রাষ্ট্রের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রিও করা হয়ে থাকে।

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় তিনটি তহবিল পরিচালনা করেছেন: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট। খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্টতা বরাবর প্রত্যাখ্যান করে এসেছেন। ২০০৮ সালের জুন মাসে যে অর্থ বছর শেষ হয়েছে সেই বছরে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট সরকারের কাছ থেকে প্রায় ১.৪৫ মিলিয়ন ডলার (৯ কোটি ৮০ লাখ টাকা) পেয়েছে। এই অর্থের বেশীরভাগই ব্যয় হয়েছে মন্দির-ভিত্তিক সাক্ষরতা ও ধর্মীয় কর্মসূচীতে। ট্রাস্ট্রের অর্থে মন্দিরের সংস্কার, চিতার চূলা সংস্কার এবং দুঃস্থ হিন্দু পরিবারের চিকিৎসা খরচ নির্বাহের জন্য ব্যয় করা হয়েছে। এ ছাড়াও বার্ষিক পূজা উদ্‌যাপনের জন্য সরকারি তহবিল থেকে প্রায় ৩৬ হাজার ডলার (২৫ লক্ষ টাকা) ব্যয় করা হয়েছে।

১৯৮০'র দশকে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্টও ২০০৮ সালের জুন মাসে সমাপ্ত অর্থ বছরে সরকারের কাছ থেকে ৪২ হাজার ৫০০ ডলার (তিরিশ লাখ টাকা) পেয়েছে। ট্রাস্ট এই অর্থ বৌদ্ধ বিহার মেরামত, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রশিক্ষণ দান এবং বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদ্‌যাপনের জন্য ব্যয় করেছে। কোন্ অনুপাতে এই অর্থ ভাগ-বণ্টন করা হয়েছে এ বিষয়ে কোন প্রকাশ্য সমালোচনা শোনা যায় নাই।

সরকার মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় উৎসব ও পবিত্র দিনগুলোকে জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করেছেন। বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমিতি ঈস্টার দিবসকে জাতীয় ছুটি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে এখনো সফল হননি।

অ-মুসলিম ধর্মীয় সংগঠনগুলোর সরকারের নিবন্ধন নেয়ার প্রয়োজন হয়নি; তবে ধর্মীয় সংগঠনসহ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বিদেশী আর্থিক সহায়তা লাভ করে এমন সকল বেসরকারি সংস্থা বা এনজিওকে সরকারের এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোতে নিবন্ধিত হতে হয়েছে। যদি এই মর্মে সন্দেহ হয় যে, সংস্থাগুলো তাদের আইনগত ও আস্থার বাধ্যবাধকতা ভঙ্গ করেছে তাহলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করার

আইনগত ক্ষমতা সরকারের ছিল। এদের বিরুদ্ধে বিদেশী তহবিল আনা বন্ধ করে তাদের কার্যক্রম সীমিত করার মত ব্যবস্থা নেয়ার কর্তৃত্ব সরকারের ছিল।

ধর্মীয় শিক্ষা সরকারি স্কুলসমূহের পাঠ্যক্রমের একটা অংশ ছিল। ছেলে-মেয়েরা স্কুলে তাদের নিজ নিজ ধর্ম শিক্ষার পাঠ নিয়েছে। তবে কিছুসংখ্যক অভিভাবক দাবি করেছেন যে, সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা এইসব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য নন এবং ঐ বিষয়ে শিক্ষা দেবার মত যথেষ্ট যোগ্যতাও তাদের নেই। স্কুল থেকে দূরে ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাসে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে শিশুদের পরিবহনের জন্য সবসময় যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না, তবুও বাস্তবে দেখা গেছে অতি অল্প সংখ্যক ধর্মীয় সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রী আছে এমন স্কুলগুলি তাদের সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের ধর্মীয় শিক্ষা দেবার জন্য স্থানীয় মন্দির বা গির্জার সাথে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় ক্লাসগুলো স্কুল সময়ের পরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদেশে কমপক্ষে ২৫ হাজার মাদরাসা রয়েছে; কিছু কিছু মাদরাসা চলে সরকারি অর্থায়নে এবং কিছু কিছু চলে ব্যক্তিগত অর্থায়নে। সরকারি পরিচালনায় কোন খ্রিস্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু স্কুল আছে বলে জানা নেই, যদিও বেসরকারি পর্যায়ে ধর্মীয় স্কুল পরিচালনার অনুমতি ছিল এবং সারা দেশে এ ধরণের বেসরকারি ধর্মীয় স্কুল ছিল।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধঃ

বাংলাদেশের সংবিধানে যে কোন ধর্ম গ্রহণ, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে, তবে সামাজিক চাপ কাউকে উদ্বুদ্ধ করে ধর্মান্তরিতকরণ নিরুৎসাহিত করেছে। বিদেশী ধর্মীয় মিশনারিদের এখানে কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তবে অন্যান্য বিদেশী অধিবাসীদের মতই তাদের ভিসা প্রাপ্তি ও নবায়নের ক্ষেত্রে প্রায়শ:ই বেশ কয়েক মাস বিলম্ব করতে হয়েছে। অতীতে বেশ কিছু মিশনারি, যাদের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত করার সন্দেহ করা হয়েছিল, তারা তাদের এক বছর মেয়াদী ধর্মীয় কর্মী ভিসার নবায়ন করাতে ব্যর্থ হয়েছেন। কিছু কিছু বিদেশী মিশনারি জানিয়েছেন যে, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বাহিনী ও সামরিক গোয়েন্দারা তাদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন আর্থিক শাস্তির বিধান করা হয়নি; তবে নির্বাচিত জন-প্রতিনিধির পদসহ সামরিক ও সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুদের সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাসে তত্বাবধায়ক সরকারের ভাঙ্গা-গড়ার সময় চার জন উপদেষ্টা পদত্যাগ করেন। এদের মধ্যে সরকারের একমাত্র সংখ্যলঘু উপদেষ্টাও ছিলেন। পরে অবশ্য প্রধান উপদেষ্টা পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা জনগোষ্ঠির প্রধান রাজা দেবাশীষ রায়কে একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় তাঁর বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেন। মি. রায় একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাঁকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা মি. মানিক লাল সমদ্দার নামের একজন হিন্দুকেও তাঁর বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। মি. সমদ্দার মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন। সাধারণভাবে সরকারের উচ্চ পদে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিল সরকার পরিচালিত বাংলাদেশ ব্যাংক- যেখানে উচ্চ পদে প্রায় ১০% অ-মুসলিম নিয়োগ পেয়েছেন। সরকারি চাকুরির জন্য গঠিত নির্বাচনী বোর্ডে প্রায়ই সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব থাকে না। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন্ ধর্মে বিশ্বাসী তা প্রকাশ করার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, তবে কোন ব্যক্তির নাম থেকেই তা সহজেই নির্ধারণ করা যায়।

বর্তমানে বাতিল 'অর্পিত সম্পত্তি আইনের' বৈষম্যের কারণে অনেক হিন্দু তাদের হারানো ভূ-সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেননি। উক্ত আইন ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুগের- যা সরকারকে শত্রুদের (বাস্তবে হিন্দুদের) জমি অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা দিয়েছিল। সরকার প্রায় ২৫ লক্ষ একর হিন্দু সম্পত্তি জব্দ করেছিল- যার কারণে দেশের প্রায় সকল হিন্দুই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। সংসদ ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন পাশ করে- যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতায় জব্দকরা সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পত্তি মূল মালিক বা তাদের উত্তরাধিকারীদেরকে ফেরত দেয়া হবে- যদি তারা বা তাদের উত্তরাধিকারীরা বাংলাদেশে বসবাসরত নাগরিক হন। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির একটি তালিকা সরকারের প্রস্তুত করার কথা ছিল এবং এই তালিকা প্রকাশের নব্বই দিনের মধ্যে মালিকানর দাবি পেশ করার কথা ছিল। সংসদ ২০০২ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের একটি সংশোধনী পাশ করে- যাতে সরকারকে অর্পিত সম্পত্তি ফেরৎদানের জন্য সীমাহীন সময় দেয়া হয়, এবং সরকারকে এই সব সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ দেয়া হয়। এই সব সম্পত্তি স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ইজারা দেবার ক্ষমতাও সরকারকে দেয়া হয়। যে সময়কালকে ধরে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে সে সময়ে সরকার এই ধরনের সম্পত্তির কোন তালিকা প্রস্তুত করেনি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক পরিচালিত সমীক্ষা অনুসারে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা সত্ত্বেও ২০০১ সাল থেকে প্রায় ২০০,০০০ হিন্দু পরিবার প্রায় ৪০,৬৬৭ একর জমি হারিয়েছেন।

মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে মহিলারা পুরুষ আত্মীয়দের তুলনায় কম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং তালাকের ক্ষেত্রে স্বামীদের চেয়ে স্ত্রীদের অধিকার কম। ইচ্ছামাফিক তালাক এবং স্বামী কর্তৃক প্রথম স্ত্রীর সম্মতি ব্যতিরেকে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের বিরুদ্ধে আইন স্ত্রীলোকদের কিছুটা সুরক্ষা প্রদান করেছে। তবে এই ধরনের সুরক্ষা শুধুমাত্র নিবন্ধনকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে গ্রাম অঞ্চলে কখনও কখনও বিবাহ নিবন্ধন করা হয় না। আইন অনুসারে একজন মুসলমান স্বামীকে তার পূর্বতন স্ত্রীর তিন মাস খোরপোষ দিতে হয়, কিন্তু এই আইন সবসময় বলবৎ করা হয় না। বিষয়টি বলবৎ করার ক্ষেত্রে সামাজিক চাপ খুবই কম এবং আদালতে এতই অ-নিষ্পন্ন মামলার চাপ থাকে যে, আদালতের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রতিকার পাওয়া অসম্ভব না হলেও- বেশ কঠিন।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অপব্যবহার

যে সময়কালকে এই প্রতিবেদনের আওতায় আনা হয়েছে সে সময়ে নারীবাদী লেখিকা তসলিমা নাসরিন বিদেশে অবস্থান করছিলেন এবং তার বিরুদ্ধে দেশের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত হানার ফৌজদারি অভিযোগ ঝুলে রয়েছে। ২০০২ সালের অক্টোবর মাসে আদালত 'ইসলাম সম্পর্কে অবমাননাকর উক্তি' করার দায়ে তাসলিমা নাসরিনকে তার অনুপস্থিতিতে এক বছর কারাদণ্ড প্রদান করেন। তার বই আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হলেও, রাস্তায় হকাররা তা প্রকাশ্যে বিক্রি করেছে।

১৫ই মার্চ, ২০০৮ তারিখে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা আহমদিয়াদেরকে তাদের একটি ধর্মীয় সন্মেলন অনুষ্ঠান করতে বাধা দেয়। ঊর্ধতন কতৃপক্ষের হস্তক্ষেপে গোয়েন্দা বিভাগ তাদের

আপত্তি তুলে নিলে পরে অবশ্য শান্তিপূর্ণভাবেই তাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৮ সালের মার্চ মাসের ২১ তারিখে পঞ্চগড় জেলার শাল সিঁড়িতে অনুরুপ একটি ঘটনা ঘটে।

প্রথম আলো পত্রিকার ব্যঙ্গ ম্যাগাজিন আলপিন ২০০৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর একটি কার্টুন প্রকাশ করে যাকে অনেকে ইসলামের প্রতি অবমাননাকর বলে মনে করেছেন। দেশের কয়েকটি শহরে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হবার পর সরকার আলপিনের ওই সংখ্যার বিক্রয় নিষিদ্ধ করে এবং এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে তা ধ্বংসের নির্দেশ দেয় এবং কার্টুনিস্ট আরিফুর রহমানকে গ্রেফতার করে। আদালত পরে আরিফুরকে মুক্তি দেন। সরকার প্রথম আলো পত্রিকার নিরাপত্তা দেন যাতে বিক্ষোভ মিছিল প্রথম আলো অফিসে আসতে না পারে। সরকার বিক্ষুব্ধ লোকদের শান্ত করার জন্য ইমামদের প্রতি আহ্বান জানান। প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক কার্টুনটি প্রকাশিত হবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং আলপিনের সম্পাদককে বরখাস্ত করেন। পরের সপ্তাহেও মতিউর রহমান এবং প্রথম আলোর প্রকাশক মাহফুজ আনামের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এবং তাদেরকে চাকুরিচ্যুত করার দাবী অব্যাহিত ছিল, যদিও সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

আলপিনের ঘটনার পর সাপ্তাহিক ২০০০ দাউদ হায়দারের একটি নিবন্ধ প্রকাশ করে। লেখক দাউদ হায়দার ১৯৭৪ সালে দেশ থেকে পালিয়ে যান তার একটি কবিতা প্রকাশিত হবার পর- যে কবিতাটিকে অনেকে ধর্ম বিরোধী বলে মনে করেছিলেন। সরকার সাপ্তাহিক ২০০০এর সকল কপি বাজেয়াপ্ত করে এবং এর সম্পাদক ক্ষমা প্রার্থণা করেন।

আলোচ্য সময়ে কোন ধর্মীয় কয়েদী থাকার বা ধর্মীয় কারণে কেউ আটক হয়েছেন বলে কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বলপূর্বক ধর্মান্তর

যুক্তরাষ্ট্র অপহৃত অথবা বেআইনিভাবে অপসারণ করা অপ্রাপ্তবয়স্ক আমেরিকান নাগরিক বা অন্য কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করার কোন খবর পাওয়া যায়নি। এরূপ কোনো নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যর্পনের ব্যাপারেও কোন অস্বীকৃতির খবরও পাওয়া যায়নি।

ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উন্নতি এবং ইতিবাচক ঘটনা

সরকার আন্ত:ধর্ম সম্পর্ক উন্নয়নের পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। যেমন, ধর্মীয় উৎসবের প্রাক্কালে সরকারের নেতারা বাণী দিয়ে শান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং এই মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন যে, যারা উৎসবে বিঘ্ন ঘটাবার চেষ্টা করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এবং বাণী দিয়ে সরকার দূর্গা পূজা, বড় দিন ও ঈস্টার সহ হিন্দু ও খ্রিস্টান উৎসবগুলি শান্তিপূর্ণভাবে পালনে সহায়তা করেছেন।

সরকার কাউন্সিল ফর ইন্টারফেইথ হারমনি- বাংলাদেশ, নামে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটিকে সমর্থন-সহায়তা দিয়েছে। ২০০৫ সালের শরৎকালে একটি ইসলামী জঙ্গীবাদী গ্রুপ দেশে শরি'য়া আইন প্রতিষ্ঠার দাবিতে বোমাবাজি শুরু করলে তারই প্রত্যুত্তরে আন্ত:ধর্মীয় সমঝোতা বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ

সহাবস্থান গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এই সংগঠনটির যাত্রা শুরু হয়। সংগঠনটি ধর্মীয় ব্যাপারে সংলাপ এবং প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠানে সহায়তা করেছিল; স্থানীয় প্রচার মাধ্যম এসব তৎপরতার কিছু কিছু খবর প্রচার করেছিল।

অনুচ্ছেদ ৩ : সামজিক নির্যাতন ও বৈষম্য

এই প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে ধর্মীয় বিশ্বাস বা চর্চার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক নির্যাতন ও বৈষম্যের ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হয়েছে। সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতা ঘটেছে এবং এতে তাদের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে; তবে এসব ঘটনা ধর্মীয় বিদ্বেষ না অপরাধ সংঘটিত করার মতলব না সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধে সংঘটিত হয়েছিল তা পরিষ্কার ছিল না। শক্তিধর রাজনীতিকদের ওপর নিজেদের প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা আলোচ্য সময়ে নাজুক অবস্থায় ছিলেন, অনেক নাগরিকদের মত তারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্নীতিপ্রবণ ও অকার্যকর বিবেচিত ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার শরণাপন্ন হতে আগ্রহী ছিলেন না। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুলিশ অকার্যকর ছিল এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সাহায্যের বেলায় তাদের পদক্ষেপ কোন কোন সময় ধীরগতির ছিল। এতে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ক্ষেত্রে এক ধরনের দায়মুক্ততার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক একে অপরের উৎসব - অনুষ্ঠান- যেমন, বিয়ে-শাদীতে, যোগ দিয়েছেন। সুন্নি মুসলমানদের কাছ থেকে কোনরুপ বাধা ছাড়াই শিয়া মুসলমানরা তাদের ধর্ম বিশ্বাস পালন করেছেন।

বেসরকারি খাতে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব কম ছিল না।

আমাদের আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত সহিংস ঘটনাগুলোর মধ্যে ছিল- হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, প্রার্থনার স্থানগুলোতে হামলা, বাড়ি-ঘর ধ্বংস, জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং আরাধ্য বস্তুর পবিত্রতা নষ্ট করা, ইত্যাদি। তবে এই ধরনের অনেক খবর নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা যায়নি এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরস্পরের মধ্যে অনেক সহিংস ঘটনা ঘটেছে, কারণ এক দলের কোন কোন কাজকে অন্য দর ইসলাম বিরোধী বলে ধারণা করেছেন। সরকার কোন কোন সময় এ ধরনের অপরাধ তদন্তে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামলা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব অপরাধীরা ছিল স্থানীয়
মাস্তানদের নেতা।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমণের ঘটনা অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তথ্য অনুযায়ী ২০০৭ সালের জুলাই মাস থেকে ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৫৮টি হত্যা, উপাসনালয়ের ওপর ৫২টি হামলা বা দখল, ৩৯টি ভূমি দখল এবং ১৩ টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) নামের একটি এ দেশীয় মানবাধিকার সংগঠন তার অন্যতম একটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, এডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাক নামে জয়পুরহাট জেলা আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতিকে ঐ জেলায় তার গ্রামের বাড়িতে ২রা এপ্রিল, ২০০৮ তারিখ রাতে ৮ / ৯ জনের একটি দল বেদম প্রহার করে। হামলাকারিদের দুই জন র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা (র‍্যাবের)

পোষাকে সজ্জিত ছিল। রিপোর্টে বলা হয়, মি. বসাক তার একজন মুসলমান প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের অভিযোগে মামলা দায়ের করার পর তার ওপর এই হামলা চালানো হয়। স্থানীয় র‍্যাব কমান্ডার তার বাহিনীর কোন সদস্য এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন।

আসক-এর অপর একটি তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয় যে, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৭ তারিখ তিন জন মুসলমান প্রতিবেশী গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের অ-মুসলিম হরলাল কোচের বাড়ীর একাংশ দখল করার চেষ্টা চালায়। রিপোর্টে দাবি করা হয় স্থানীয় পুলিশ হরলালের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

পূর্ববর্তী রিপোর্টিং সময়কালে ঘটলেও সেনাবাহিনী বর্তমান রিপোর্টিং সময়কালে হিন্দুদেরকে তাদের ভূমি থেকে উচ্ছেদের বড় রকমের ঘটনা ঘটায়নি। পূর্ববর্তী প্রতিবেদন সময়কালে সেনাবাহিনী ঢাকার মিরপুরে সেনা নিবাস সংলগ্ন এলাকায় ১২০টি পরিবারকে তাদের বাড়ীঘর থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালিয়েছিল। এদের ৮৫ ভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। ঐ সম্পত্তিতে একটি মন্দিরও ছিল। সেনাবাহিনী ১৯৬১ সালের একটি ভূমিক্রয় দলিলের ভিত্তিতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালিয়েছিল। জমির মালিকরা আদালতে এই হুকুম দখল এবং উচ্ছেদ অভিযান চ্যালেঞ্জ করে। আমাদের এই রিপোর্টিং সময়কালের শেষ পর্যন্তও মামলাটি অ-নিষ্পন্ন অবস্থায় ছিল।

জাতীয় দৈনিক পত্রিকা জনকণ্ঠের খবরে বলা হয়, ২০০৮ সালের ২০শে মার্চ তারিখে শেখর নগর গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের একটি দেবী মূর্তি পূজা উৎসবের সময় ভেঙ্গে দেয়া হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত একজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে। স্থানীয় একটি প্রচার মাধ্যমের খবরে বলা হয়, ফরিদপুর জেলায় দুটি মন্দির এবং নয়টি মূর্তি ধ্বংস করা হয়।

২০০৭ সালের এপ্রিল মাসে মৌলভীবাজারের ক্যাথলিক খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতারা স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা হয়রানির বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেন। বন বিভাগের লোকেরা মনছড়া বন দেখাশুনা করে, এই বনে অনেক খাসিয়ার বাস। তারা অভিযোগ করেছেন যে, বন বিভাগের কয়েকজন কর্মকর্তা খাসিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্য স্থানীয় ক্যাথলিক মিশনের প্রধান সহ তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছেন। খাসিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং কুলাউড়া উপজেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে ২০০৮ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত সভায় এই মর্মে সরকারি আশ্বাস মেলে যে, খাসিয়ারা বন বিভাগের জমি দখল না করে নিজ নিজ জায়গায় বসবাস করলে খাসিয়াদের হয়রানি করা হবে না। এই বিরোধ এখনও শেষ হয় নি, কারণ, বন বিভাগ কয়েকজন খাসিয়ার বিরুদ্ধে বন বিভাগের জমি দখলের অভিযোগে নুতন করে মামলা দায়ের করে।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে বন বিভাগ জাতীয় উদ্যান এলাকায় বসবাসরত সংখ্যলঘু সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানিমূলক ঘটনায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকার ২০০৭ সালে বন বিভাগের কয়েকজন শীর্ষ-পর্যায়ের কর্মকর্তাকে আটক করে এবং তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দায়ের করে। কর্মকর্তাদের গ্রেফতারের এই সকল ঘটনার পর থেকে বন এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের বিরুদ্ধে আর নুতন করে কোন মামলা দায়ের করা হয় নি, এবং হয়রানির ঘটনাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর হয়রানি ও সহিংসতার খবর পাওয়া গেছে। খ্রিস্টান লাইফ বাংলাদেশ (সিএলএফ)-এর মতে ২০০৮ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় একটি মুসলিম মৌলবাদী গ্রুপের সদস্যরা দুই জন খ্রিস্টান ব্যক্তির ওপর আক্রমণ চালায়। খ্রিস্টান ঐ দুই ব্যক্তি ঐ সময়ে আর্সেনিক দূষণ, বাল্য বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করছিলেন।

শান্তি বাহিনী নামে পরিচিত পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি নিষিদ্ধ ঘোষিত বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপের সদস্যরা ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার সিএলবির সমাজ সচেতনতা দলের সদস্য চেংগো মার্মার ওপর হামলা চালায়। সিএলবির মতে, চেংগো খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী হওয়ায় প্রধানত: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে গঠিত শান্তি বাহিনী তার ওপর এই হামলা চালিয়েছে। সিএলবি জানায়, অপর এক ঘটনায় ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে ময়মনসিংহে একজন মুসলিম লোক খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারক পিতার এক কন্যাকে ধর্ষণ করে। খ্রিস্টান ঐ ব্যক্তি স্থানীয় কয়েকজন হিন্দুকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন।

সিএলবি জানায়, একদল লোকের চাপে পুলিশ উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী জেলায় ২০০৭ সালের ২৬ শে জুলাই তারিখে সঞ্জয় রায় নামে গীর্জার এক প্যাস্টর বা ধর্মীয় নেতাকে আটক করে। মি. রায় ২৫ জন মুসলমানকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন- এজন্যই লোকজন তাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন। সিএলবি জানায়, দুই দিন আটক থাকার পর মি. রায়কে ছেড়ে দেয়া হয় এবং ধর্মান্তরিতদের বেশীরভাগই আবার ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন।

মানবাধিকার গ্রুপ এবং পত্র-পত্রিকার খবরে বলা হয়, পল্লী অঞ্চলে নৈতিক স্খলনের অভিযোগে মহিলাদের বিরুদ্ধে বিচার হাতে তুলে নেয়ার ঘটনা ঘঠেছে। এসব ঘটনার মধ্যে বেত্রাঘাতও ছিল, আর এসব ঘটনা ঘটেছে প্রায়শ:ই ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে। আসক জানিয়েছে, ২০০৭ সালে ধর্মীয় নেতারা ৩৫ টি ফতোয়া দিয়েছেন। এসব ফতোয়ায় বেত্রাঘাত সহ অন্যান্য শারীরিক শাস্তি এবং পরিবার ও সমাজের লোকদের দ্বারা একঘরে করে রাখার বিধানও ছিল।

ঢাকা ও অন্যান্য কয়েকটি স্থানে প্রায় এক লাখ আহমদিয়া বসবাস করেন। মূলধারার মুসলমানরা আহমদিয়াদের মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন, তবে অধিকাংশ লোক কোন প্রকার ভয়ভীতি ও নির্যাতন ছাড়া নিজ ধর্ম পালন করার আহমদিয়াদের অধিকার সমর্থন করেন। তবে যারা আহমদিয়া মতবাদের বিরোধিতা করেন তাদের দ্বারা আহমেদিয়ারা এখনও উৎপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছেন।

২০০৪ সাল থেকে আহমদিয়া বিরোধী চরমপন্থীরা, যথা, আন্তর্জাতিক খতমে নবুয়ত আন্দোলন, বাংলাদেশ, এবং এই গ্রুপ থেকে বেরিয়ে আসা অপর একটি ক্ষুদ্র গ্রুপ - খতমে নবুয়ত আন্দোলন, বাংলাদেশ, সরকারের কাছে প্রকাশ্যে দাবি করেছে যে আহমদিয়াদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে আইন পাশ করতে হবে। সরকার এই চরমপত্র অগ্রাহ্য করেছে এবং আহমদিয়া স্থাপনাগুলোকে সাফল্যের সাথে প্রতিবাদকারীদের হাত থেকে নিরাপদ রেখেছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারী মাসে দেশে জরুরী আবস্থা জারির পর থেকে আহমদিয়া বিরোধী গ্রুপগুলি আর কোন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেনি। তবে আহমদিয়াদের প্রতি বৈষম্য অব্যাহত ছিল। ২০০৭ সালের ২৪শে আগস্ট স্থানীয় প্রশাসন কুস্টিয়ায় আহমদিয়াদের একটি মসজিদের ভেতরে আয়োজিত এক ধর্মীয় শিক্ষার ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছিল।

আওয়ামী লীগ তার বহু সংখ্যালঘু ও উদারপন্থী সমর্থককে হতাশ করে দিয়ে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের সাথে একটি নির্বাচনী চুক্তি স্বাক্ষর করে । খেলাফত মজলিশ হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র ইসলামপন্থী গ্রুপ, জঙ্গীবাদীদের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে বলে বলা হয়ে থাকে। সম্পাদিত ঐ চুক্তিতে আওয়ামী লীগ এই মর্মে অঙ্গীকার করেছিল যে, ভবিষ্যৎ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার কিছু ফতোয়ার স্বীকৃতি দেবে এবং হযরত মুহাম্মদই যে শেষ নবী তা সরকারীভাবে ঘোষণা করবে- নবী সম্পর্কিত এই ঘোষণা আহমদিয়াদের জন্য একটি সরাসরি চ্যালেঞ্জ। আহমদিয়া এবং উদারপন্থী লোকেরা এই বলে এই চুক্তির সমালোচনা করেন যে, চুক্তিটি রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য করা হয়েছে এবং এটি দলের মূল নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। এই সব সমালোচনা এবং দলের সিনিয়র নেতাদের প্রকাশ্য বিদ্রোহের কারনে আওয়ামী লীগ দেশে জরুরী অবস্থা জারির পর চুক্তিটিকে অগোচরে হারিয়ে যেতে দেয়।

অনুচ্ছেদ ৪: যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নীতি

যুক্তরাষ্ট্র সরকার ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়টি সরকারের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে থাকে। প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ২০০৮ সালের শেষ দিকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং সে নির্বাচনে যাতে সকল জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় পুরাপুরি অংশ নিতে পারে তার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ধর্মীয় ও উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের অধিকারসহ সকল মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ অব্যাহত রাখে। দূতাবাসের কর্মকর্তারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলি সহ অন্যান্য ঘটনা অনুসন্ধান করেন এবং সুশীল সমাজের সদস্য, এনজিও ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতা এবং অন্যান্য নাগরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং পরবর্তী নির্বাচনের সহিংসতার বিষয়ে তাদের উদ্বেগ নিয়ে আলোচনা করেন। তারা সংখ্যালঘুদের অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে আইনপ্রয়োগকারীদের উদ্যোগী ভূমিকা নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করেন।

দূতাবাস ও যুক্তরাষ্ট্রের সফরকারী সরকারি কর্মকর্তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উদ্বেগ শোনার জন্য এবং তাদের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের বিষয়টি জানানোর জন্য উক্ত সম্প্রদায়গুলোর সদস্যদের সাথে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ করেন।

দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মভিত্তিক ত্রাণ সংস্থাগুলোকে সহায়তা প্রদান করেছে যাতে তারা স্কুল ও অন্যান্য প্রকল্পের অনুমোদনের জন্য কাগজপত্র তৈরি করতে পারে। বাংলাদেশ সরকার এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী ছিল এবং সাধারণভাবে সমস্যা সমাধানে সহায়ক ছিল। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস এদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসব সংস্থার পক্ষে কাজ করেছে- যাতে তাদের ভিসা সমস্যার সমাধান হয়।

ইমাম প্রশিক্ষণ সূচি প্রণয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে উৎসাহিত করেছে। প্রাথমিক পাইলট প্রকল্পের পর যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইমামদের জন্য মানবাধিকার ও নারী-পুরুষ সমতার বিষয়ে প্রশিক্ষণ অধিবেশনের আয়োজন করেছে। টানা তৃতীয় বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রখ্যাত মুসলমান আলেমকে এদেশে সফরে এসে বাংলাদেশী শ্রোতাদের উদ্দেশে বক্তৃতা করার ব্যবস্থা করে। তিনি দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর রাজশাহী সফর

করেন এবং ঢাকাতেও বেশ কয়েক দল শ্রোতার সামনে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল পবিত্র কুরআনে বর্ণিত সহিষ্ণুতা, স্বাধীনতা ও নারীপুরুষ সমতার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরা।

প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়কালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী মানুষজন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন সে বিষয়টি বরাবর উত্থাপন করে এসেছে। প্রতিবেদনে বিবেচনাধীন সময়ে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম সফর করে সেখানকার সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাদেরকে সংখ্যলঘুদের প্রতি আচরণে যুক্তরাষ্টের উদ্বেগের কথা ব্যক্ত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র সমর্থিত গণতন্ত্র ও সুশাসন কর্মসূচীগুলোর মধ্যে সহিষ্ণুতা ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রকাশের তারিখ: ১৯ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৮